The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

উপমহাদেশে ফারসি চর্চায় আমির খসরু দেহলাভির অবদান

[Contribution of Amir Khusrow Dehlavi in Practicing Persian in the Subcontinent]

Dr. Md. Ataullah
Professor, Department of Persian Language & Literature, University of Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 20 February 2025
Received in revised: 10 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Reflection Social Theme,
Imam Khmeini, Poetry.

ABSTRACT

Persian is one of the oldest and richest languages in the world. Evidence of the existence of the Persian language can be found in the traces of ancient civilizations about three thousand years before Christ. The language arrived in the Indian subcontinent from Persia in the early 13th century. Persian was the state language of this subcontinent for more than six hundred years (1203/4-1837) after the victory of Bengal by Ikhtiyar Uddin Muhammad Bakhtiyar Khalji. During this period a large number of poets practiced Persian in this region with enthusiasm and dedication. Among them Amir Khusrow Dehlavi (1253-1325 AD) was a significant figure in Persian literature in this subcontinent, contributing to the flourishing of Persian in the region. He composed extensively in Persian, infused Persian elements into Hindustani music, and played a key role in the development of Qawwali, a devotional Sufi singing style. He used 11 metrical schemes with 35 distinct divisions. He wrote in many verse forms including ghazal, masnavi, quita, rubai, do-baiti and tarkib-band. His contribution to the development and practice of Persian was unparalleled. This article attempts to describe the contributions of Amir Khusrow Dehlavi in practicing Persian in the Subcontinent.

ভূমিকা

ফারসি পৃথিবীর প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী ভাষাসমূহের মাঝে অন্যতম। এ ভাষার ইতিহাসও সুদীর্ঘকালের। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় তিনহাজার বছর আগে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহে প্রাচীন ফারসি ভাষার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষ্টি-কালচার ও সাহিত্য-সংস্কৃতির রয়েছে এক অমূল্য রত্নভাণ্ডার। ফারসি ভাষার কেন্দ্রবিন্দু যদিও পারস্য ছিলো, কিন্তু এর পরিধি ছিলো ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। প্রাচীন পারস্য ছাড়াও এ ভাষা পূর্ব রাশিয়া, আফগানিস্তান, তুরস্ক, ইরাক ও পাকিস্তানে ছিল বহুল প্রচলিত। সুদূর পারস্য থেকে এ ভাষা খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করে। ১২০৩ মতান্তরে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে এ ভাষা তৎকালীন বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। কালক্রমে এ ভাষা অত্র অঞ্চলের মানুষের প্রাণের ভাষায় রূপান্তরিত হয়। ফারসি ভাষা বঙ্গদেশের রাজভাষা হিসেবে দীর্ঘ ছয়শত বছরেরও অধিক সময় (১২০৩-১৮৩৭ খ্রি.) কাল ধরে প্রচলিত থাকে। কালের এ দীর্ঘ পরিক্রমায় ভারত উপমহাদেশে ফারসি সাহিত্য পরিমণ্ডলে আবির্ভাব হয়েছে অনেক কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকের, যাঁরা নিজেদের শ্রম ও মেধার বিকাশ ঘটিয়ে ফারসি সাহিত্যকে তুলে নিয়ে গেছেন একটি সম্মানজনক অবস্থানে। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, কবি আমির খসরু দেহলাভি। যাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে উপমহাদেশে ফারসি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে সমাসীন হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে উপমহাদেশে ফারসি চর্চায় আমির দেহলভির অবদান সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

আমির খসরু দেহলভির সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা

আমির খসরু দেহলভী ছিলেন ভারত উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত কবি। তাঁর পুরো নাম আবুল হাসান ইয়ামিন উদ্দিন খসরু। তিনি সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমীশের রাজত্বকালে ভারতের উত্তর প্রদেশের ইতাহ জেলার অন্তর্গত পটিয়ালী নামক স্থানে ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম আমির সাইফুদ্দিন মাহমুদ (তুর্কি সেনাপতি) এবং মাতা ছিলেন একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভারতীয় নারী। বাল্যকালে মাত্র সাত বছর বয়সে পিতা মারা গেলে, কবি তাঁর নানা ইমাদ-উল-মূল্ক এর বাড়িতে লালিত-পালিত হন। তিনি একাধারে ছিলেন একজন কবি, সূফী, সঙ্গিতজ্ঞ, দার্শনিক এবং ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মেলবন্ধনের প্রতিক। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন দিল্লী সালতানাতের দরবারী কবি এবং সূফী সাধক। ভারত উপমহাদেশের প্রায় পাঁচজন সুলতানের রাজত্বকালে তিনি কবিতা রচনা করেন। তাঁরা হলেন

বলবন, কায়কোবাদ, জালাল উদ্দিন খিলজি, আলাউদ্দিন খিলজি এবং গিয়াস উদ্দিন তুঘলক। তিনি স্থানীয় মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ফারসি কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। মাত্র ২০ বছর বয়সেই আমির খসরু প্রথম সারির কবিদের মর্যাদা লাভ করেন।[২]

কবি আমির খসরু প্রথমে আলাউদ্দীন কিশলু খানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। সুলতান তাঁর পূত্র নাসির উদ্দীন বুগরা খানকে সামানার গভর্নর নিযুক্ত করলে কবি তাঁর অধীনে কাজ শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি বুগরা খানের সাথে বাংলায় আগমন করেন। পরবর্তীকালে বাংলা থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করে সুলতানের জ্যেষ্ঠপূত্র মুহাম্মদ কাআন-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে তাঁর সাথে মুলতান গমন করেন।[৩] ১২৮৪ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধে মুহাম্মদ কাআন নিহত হলে কবি আমির খসরু তাদের হাতে বন্দি হন। অবশ্য শীঘ্রই তিনি মুক্তি লাভ করে দিল্লী ফিরে আসেন এবং মালিক আলী সারজানদার হাতাম খানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে অযোধ্যায় গমন করেন। ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে হাতাম খান অযোধ্যার গভর্নর নিযুক্ত হলে আমির খসরু দুই বছর সেখানে অবস্থান করেন। পরবর্তীকালে তিনি দিল্লতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুলতান কায়কোবাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সুলতান জালাল উদ্দীন খিলজীর শাসনামলে (১২৯০ খ্রি.-১২৯৫ খ্রি.) কবি আমির খসরুকে ১,২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা হারে বাৎসরিক রাজকীয় ভাতা প্রদান করা হত। পরবর্তীতে আলাউদ্দীন খিলজীও কবির এ ভাতা বহাল রাখেন।[৪] কবি আমির খসরু বিখ্যাত সূফী সাধক নিযামুদ্দীন আওলিয়ার শীষ্যত্ব ও বাইয়াত গ্রহণ করেন। নিযামুদ্দীন আওলিয়া কবিকে খুব ভালবাসতেন এবং তাঁকে 'তরকুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন।[৫] প্রখ্যাত কবি আমির খসরু সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলে তাঁর মুর্শিদের মৃত্যুর ছয় মাস পর ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৭২ বছর বয়সে দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর মুর্শিদ নিযাম উদ্দিন আওলিয়ার পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৬]

আমির খসরু দেহলভীর সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা

আমির খসরু দেহলভী ছিলেন উপমহাদেশের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বি একজন ফারসি-উর্দু কবি। যিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে পুরো ফারসি সাহিত্যাঙ্গনে নিজেকে একজন সফল কবি হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। তাঁর কাব্য সাহিত্য ছিল উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় ফারসি সাহিত্যের দর্পন। খসরুর কাব্যে উপমহাদেশের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দির মুসলিম সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় রীতি-নীতি, প্রেম-ভালোবাসা, নীতি-নৈতিকতা, অধ্যাত্মবাদসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে। যা তাঁর সমসাময়িক কালের কোন ইরানী কিংবা ভারত উপমহাদেশের কোন কবি-সাহিত্যকের দ্বারা সম্ভব হয়নি। তিনি প্রায় সাহিত্যের সকল শাখায় পরিভ্রমণ করেন। এ ধরণের কৃতিত্ব অত্যন্ত বিরল। তাঁর রচনাবলী সাহিত্য জগতের এক অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার।[৭] তিনি ফারসি সাহিত্যে গযল, রুবাঈ, মসনভী, কাসীদা, মর্সিয়া প্রভৃতি শ্রেণীর কবিতা এবং গদ্য সাহিত্য রচনা করেন।[৮] নিম্নে কবির ফারসি সাহিত্যকর্মসমূহের আলোচনা উপস্থাপিত হলো যা উপমহাদেশে ফারসি চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দিওয়ান: কবি আমির খসরুর পাঁচটি *দিওয়ান* গ্রন্থ রয়েছে যা বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে অত্যন্ত সমাদৃত। নিম্নে এতদ্সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

১. তুহফাতুস সিগার

তুহফাতুস সিগার বা তারুণ্যের দান কাব্যগ্রন্থটি কবি আমির খসরুর প্রথম *দিওয়ান* যা তাঁর ষোল থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যে ১২৭২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন-এর শাসনামলে রচিত হয়। এ গ্রন্থটির মধ্যে কাসিদা, গযল, তারজিবান্দ প্রভৃতি কবিতা স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থটি তিনি ফারসি সাহিত্যের খ্যাতিমান কাসিদা রচয়িতা খাকানির অনুকরণে রচনা করেন।[৯] এছাড়াও এতে বিখ্যাত কাসিদা রচয়িতা আনওয়ারি ও সানায়ির প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। এ গ্রন্থটি তিনি সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন, তাঁর পূত্র নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদ কাআন এবং শেখ নিযাম উদ্দীন আওলিয়ার প্রসংশায় রচনা করেন।[১০] *তুহফাতুস সিগার* কাব্যগ্রন্থ হতে কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো,

خوش خلعتی است جسم ولی استوار نیست خوش	حالتی است عمر ولی پایدار نیست
خوش منزلی است عرصهٔ روی زمین دریغ	کانجا مجال عیش و مقام قرار نیست
دل در جهان مبند که کس را ازین عروس	جز آب دیده خون جگر در کنار نیست
غره مشو ز جاه مجازی به اعتبار	کاین جاه را به نزد خدا اعتبار نیست
زنهار اختیار مکن بهر منزلی	کانجا بدست هیچکس اختیار نیست[১১]

২. ওয়াসাতুল হায়াৎ

ওয়াসাতুল হায়াৎ বা মধ্য-জীবন এটি কবির দ্বিতীয় *দিওয়ান* গ্রন্থ। যা তিনি চব্বিশ থেকে বত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে ১২৮৩ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। এ গ্রন্থের কবিতাগুলোর অধিকাংশই তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু নিজাম উদ্দিন আওলিয়ার প্রশংসায় রচিত। অবশিষ্ঠ কবিতাগুলো বলবনের জৈষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদ খান, সুলতান কায়কোবাদ এবং নির্বাচিত অমাত্যদের প্রশংসায় রচিত

হয়েছে।[১২] কবির এ কবিতাগুলি যৌবনের উন্মাদনা, আবেগ-অনুভূতি, চঞ্চলতা, উচ্ছলতা, মাধুর্য এবং জীবনরসের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে অত্যন্ত মাধুর্যতার সাথে যা উপমহাদেশের অন্য কোনো কবির কবিতায় খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত বিরল।[১৩]

৩. গুররাতুল কামাল

আমির খসরু রচিত *দিওয়ান*গুলোর মধ্যে *গুররাতুল কামাল* বা পূর্ণতার চরমোৎকর্ষ গ্রন্থটি অন্যতম। এটি তাঁর তৃতীয় *দিওয়ান* গ্রন্থ যা তিনি চৌত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। এটি হলো আমির খসরুর সবচেয়ে দীর্ঘ *দিওয়ান* গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে তিনি একটি ভূমিকাসহ ইরানের বিখ্যাত কবি সানায়ী, খাকানী, সা'দী ও নিযামীর প্রশংসা করেছেন।[১৪] ৬৯৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটির প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫টি করে পংক্তি রয়েছে। এ গ্রন্থটিও কবি তাঁর মুর্শিদ নিযাম উদ্দীন আওলিয়া, সুলতান জালাল উদ্দীন ফিরোজ শাহ, সুলতান রোকনউদ্দীন ইব্রাহীম, সুলতান মুইজউদ্দীন কায়কোবাদসহ আরো অনেকের প্রশংসায় রচনা করেন। কবির এ *দীওয়ান* গ্রন্থে বর্ণিত বিভিন্ন কবিতায় তাঁর তিক্ষ্ণ মেধা ও দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। মনের আকাঙ্খা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ কবিতাগুলো বিশ্ব কাব্য পরিমণ্ডলে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে আছে। এছাড়াও এ গ্রন্থে আরবীর উপর ফারসির ছন্দ ও সুরের প্রাধান্য, কবিতার শ্রেণীবিভাগ ও কবিতার শ্রেষ্ঠত্যের মান নির্ণয় সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।[১৫]

৪. *বাকিয়্যাহ নাকিয়্যাহ*

বাকিয়্যাহ নাকিয়্যাহ এটি কবির চতুর্থ *দীওয়ান* গ্রন্থ। যা তিনি পঞ্চাশ থেকে চৌষট্টি বছর বয়সের মধ্যে ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির মৃত্যুর পর এ দিওয়ানটি সংগ্রহ করা হয়। এ সময় কবি কাব্য রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কবি নিজেই বলেন বত্রিশ বছর বয়সে যখন কাব্য রচনা করতাম তখন ভাবতে হতো কিন্তু চৌষট্টি বছর বয়সে এসে মুক্তার মত কবিতা রচনা হয়। ইচ্ছে করলেই মুক্তার মতো কবিতা ঝড়তে থাকে যা সব কুড়াতে পারতাম না। যদি কুড়াতে পারতাম তবে এরকম দীওয়ান হতো না; বরং সাগরের মত কয়েকটি দিওয়ান হতো। এ গ্রন্থে কবি নিজের গুণকীর্তনের পাশাপাশি মুর্শিদ নিযাম উদ্দীন আওলিয়া, শাইখ আলাউদ্দীন, কুতুব উদ্দীন মোবারক শাহ্, শামসুল হক খিজর খান, নাসিরুল মূলক ও হামিদুল্লাহসহ আরো অনেকের প্রশংসা রয়েছে। এছাড়াও এতে ৭১৫ হিজরীর ৮ই শাওয়াল মৃত্যুবরণকারী সুলতান আলা উদ্দীন মুহাম্মদ খিলজী (৬১৫-৭১৫ খ্রিস্টাব্দ) এর শোকগাঁথা, যুবরাজের বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা বর্ণিত হয়েছে।[১৬]

৫. *নেহায়াতুল কামাল*

আমির খসরু রচিত *নেহাইয়াতুল কামাল* গ্রন্থটি তাঁর জীবনের শেষ সময়ে সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক-এর মৃত্যুর পর সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক-এর শাসনামলে ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। এতে তিনি কুতুবউদ্দীন মোবারক শাহ্-এর মার্সিয়া সম্বলিত গযল লিপিবদ্ধ করেছেন। কবির বৃদ্ধ বয়সের অসহায়ত্ব ও মহান আল্লাহর উপর অকুণ্ঠ নির্ভরতার প্রতিধ্বনিও এ গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে।[১৭] এছাড়াও এ গ্রন্থের শুরুতে তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা, রাসুল স.-এর প্রশংসা এবং শেষে নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার প্রশংসা সন্নিবেশিত করেছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে। বাইশটি কাসিদা, পাঁচটি তারজিবান্দ, পাঁচটি মাসনভি এবং কিছু গজল ও খণ্ড কবিতার সমন্বয়ে গ্রন্থটির পরিসমাপ্তি করেছেন। কবিতাগুলো দীর্ঘাকারে ধর্মকর্ম, প্রেম-ভালোবাসা ও মানবতা সম্পর্কে রচিত।

খামসা

আমির খসরু দেহলভী ইরানের বিখ্যাত রোমান্টিক কাব্য রচয়িতা নিযামী গাঞ্জুবীর অনুসরণে পাঁচটি রোমান্টিক মাসনভী গ্রন্থ রচনা করে বিশ্বসাহিত্য দরবারে খ্যাতি অর্জন করেছেন। পারস্যসহ বিশ্বের অনেক দেশের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকগণ নিযামীর অনুকরণে *খামসা* রচনায় আত্মনিয়োগ করেন কিন্তু কেউ আমির খসরুর ন্যায় এত সফল হতে পারেননি। তিনিই একমাত্র কবি যিনি ওযন তথা ছন্দমিল ও বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে পাঁচটি মাসনভী গ্রন্থ রচনা করে ফারসি সাহিত্য পরিমণ্ডলে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন। নিম্নে তাঁর এ *খামসা* সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

১. *মাত্‌লাউল আনওয়ার*

আমির খসরুর এ গ্রন্থটি নিযামী গাঞ্জুবীর বিখ্যাত মাসনভী গ্রন্থ *মাখযানুল আসরার* এর অনুকরণে রচিত। তিন হাজার তিনশত দশটি পংক্তির সমন্বয়ে রচিত এ গ্রন্থটি কবি ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে রচনা করে আলাউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্ এর নামে উৎসর্গ করেন। এতে মহান আল্লাহর প্রশংসা, রাসূল স.-এর প্রশংসা, মুনাজাত, তাঁর মুর্শিদ নিযামউদ্দীন আওলিয়ার প্রশংসা, তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের প্রশংসা এবং বিশটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলোতে মানব সৃষ্টির রহস্য, অবিনস্বর বিশ্ব, প্রজার প্রতি আচরণ, বার্ধক্যের গুণাবলী, সৃষ্টিকুলের প্রতি আস্থা, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, সৃষ্টিজগতের বর্ণনা, পার্থিব ব্যয় বর্জন, পরকালের দৃশ্য, পৃথিবীর অবিশ্বস্ততা, মাটির বাড়ীকে বিদায়, বিশ্বের প্রতি নিন্দা, অলসতার প্রতি ভৎসনা, পরশ্রীকাতরতার প্রতি নিন্দা, চাতুরতার প্রতি ঘৃণা, একান্তে আল্লাহর ইবাদত, প্রতারণার প্রতি নিন্দা, পরকালকে স্বাগত ও অন্যায়কারীদের প্রতি অভিযোগ প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে।[১৮]

২. *শিরিন ওয়া খসরু*

আমির খসরুর এ গ্রন্থটি ইতিহাসের বিখ্যাত প্রণয়োপাখ্যান নিযামী গাঞ্জুবীর *খসরু ওয়া শিরিন* এর অনুকরণে ১২৯৮ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। এ গ্রন্থে খসরু, শিরিন ও ফরহাদের ত্রিভূজ প্রেমের কাহিনী অত্যন্ত সুনিপুণভাবে কাব্যাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি ছন্দ থেকে যেন প্রেমের সুবাসিত আবাস প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়াও এতে ঐতিহাসিক বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা বর্ণিত হয়েছে। আলাউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্ এর নামে উৎসর্গকৃত এ গ্রন্থটিতে ৪,১২৪ টি শ্লোক রয়েছে।[১৯]

৩. *মাজনুন ওয়া লাইলী*

কবি আমির খসরু রচিত *মাজনুন ওয়া লাইলী* কাব্যগ্রন্থটি ফারসি সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন। এ গ্রন্থটি তিনি নিযামী গাঞ্জুবীর ইতিহাসখ্যাত *লায়লী ওয়া মাজনুন* এর অনুকরণে ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ৪৪ বছর বয়সে রচনা করেন। ওজন, ভাব-বিষয়বস্তু সকল দিক থেকেই ইহা *লাইলী ওয়া মাজনুন* কাব্যগ্রন্থের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এতে দুই হাজার ছয়শত ষাটটি পংক্তি রয়েছে।[২০] এ গ্রন্থে কবি আমির খসরু মাজনুন ও লাইলীর রোমান্টিক প্রেম কাহিনী বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে।[২১] *মাজনূন ওয়া লাইলী* কাব্যগ্রন্থটি যুগদুর্লভ পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের জন্য চির অম্লান হয়ে থাকবে। প্রথমত, এটি যথার্থ একটি Trageedy, কারণ *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *কারবালা কাহিনী* কিংবা অন্যান্য বিয়োগান্তর বা করুণ রসাত্মক রচনায় যথার্থ Tragic effect নেই। দ্বিতীয়ত, এ কাব্যগ্রন্থ আশ্চর্যভাবে অশ্লীলতা মুক্ত। তৃতীয়ত, এটি একটি নিছক মানবিক প্রণয়োপাখ্যান। চতুর্থত, এটি কোন অনুবাদ গ্রন্থ নয়, লোকশ্রুত পুরনো কাহিনীর স্বাধীন অনুসৃতি। পঞ্চমত, এ কাব্যগ্রন্থের কাহিনী অলৌকিকতা মুক্ত প্রায় বাস্তব ঘটনা ভিত্তিক। সর্বোপরি এ কাব্যগ্রন্থটিতে প্রেম ও ভালোবাসার নিবিড় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে।

৪. *অঈনে-এ সেকান্দারী*

এ গ্রন্থটি বাদশাহ বাহরামগোর-এর ঘটনাবলীর আলোকে নিযামী গাঞ্জুবীর *ইস্কান্দার নামা* গ্রন্থের অনুকরণে বাহরে মোতাকারেবে মোসাম্মান ওজনে ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। এ গ্রন্থটিও আলাউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্-এর নামে উৎসর্গকৃত। এতে চার হাজার চারশত পঞ্চাশটি পংক্তি রয়েছে। এ গ্রন্থের পংক্তিসমূহ কাজী শিহাবউদ্দীন অধ্যয়ন করে সংশোধন করে দিয়েছেন।[২২] আমির খসরু রচিত *অঈনে-এ সেকান্দারী* কাব্যগ্রন্থে মূলতঃ ম্যাসিডোনিয়ার বাদশা এস্কান্দার (আলেকজান্ডার)-এর বিস্ময়কর জীবন কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এ কাব্যগ্রন্থে তিনি এস্কান্দার (আলেকজান্ডার) যে একদিকে দিগ্বীজয়ী বীর ও অন্যদিকে ভবিষ্যতদর্শী মহান দার্শনিক ছিলেন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন কাব্যাকারে। পাশাপাশি এস্কান্দারের (আলেকজান্ডার) বীরত্ব ও দেশ জয়ের কাহিনীসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জয় করে তাদের রীতি-নীতি ও সভ্যতা দেখে পরিশেষে তাঁর মনে এক প্রশ্নের উদয় হয়। তাহলো, কেন এ বিজয় যাত্রা? কিসের জন্য তিনি অপর জাতির উপর অস্ত্র-প্রয়োগ ও আধিপত্য বিস্তারের অধিকারী? এরা কি তাঁর নিজের জাতির চেয়ে হীন? এর চেয়ে নিজ রাজ্যে নির্জনে সাধনায় সময় কাটালে হয়ত জীবনে এর চেয়ে অধিক সফলতা আসত। অতঃপর এস্কান্দার তাঁর তরবারী কোষবদ্ধ করেন এবং নিজ দেশে ফেরার পথে রাস্তায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাই এস্কান্দার জীবন সায়াহ্নে এসে জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "শূন্য হাতে পৃথবীতে এসেছিলাম, আবার শূন্য হাতেই ফিরে যাচ্ছি। পৃথিবী জয়ের কোন সম্পদই আমার সাথে যাচ্ছে না। এমনকি একমুঠো মাটিও না। এইতো জীবনের পরিনাম! ভোরে পর্বত গায়ে পাখি গিয়ে বসে, আবার দিন শেষে কোথায় যেন সে উড়ে যায়। কিন্তু পর্বত শুধু আগের জায়গাতেই থেকে যায়। এ পৃথিবীতে আমাদের আগমনটাও এমনই। অতএব তোমরা বৃথা আমার জন্য ধুলায় মাথা না খুড়ে আমার আত্মার মুক্তির জন্য পরম করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা করিও। উপরোল্লিখিত বিষয়াদি ছাড়াও আমির খসরু তাঁর *অঈনে-এ এস্কান্দারী* গ্রন্থে আরও অনেক দার্শনিক বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন।

৫. *হাশ্ত বেহেশ্ত*

এ গ্রন্থটি নিযামীর *হাফ্ত পেইকার* এর অনুকরণে ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে রচিত। এতে তিন হাজার তিনশত বায়ান্নটি পংক্তি রয়েছে।[২৩] হাশত শব্দের অর্থ আট, আর বেহেশত শব্দের অর্থ স্বর্গ। সুতরাং *হাশত বেহেশত* শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আটটি স্বর্গ। এ কাব্যগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সাসানী রাজবংশের বিখ্যাত বাদশাহ রাহরামগোর ও তাঁর রাজকুমারীদের সাথে সম্পৃক্ত। এ গ্রন্থটিতে তাঁদের প্রেমকাহিনী কাব্যাকারে উপস্থাপিত হয়েছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে। বাদশাহ বাহরামগোরের এ প্রণয় কাহিনী আমির খসরু তাঁর *হাশত বেহেশত* কাব্যগ্রন্থে কাব্যাকারে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে। আমির খসরু রচিত *হাশত বেহেশত* কাব্যগ্রন্থটি সাহিত্যিকমান ও কাব্যশৈলীগত দিক থেকে এত উচুস্তরের, যা কবি ও তাঁর কাব্যকে ফারসি সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্য দরবারে খ্যাতি অর্জন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ঐতিহাসিক মাসনভী গ্রন্থসমূহ

কবি আমির খসরু রচিত পাঁচটি ঐতিহাসিক মাসনভী গ্রন্থ রয়েছে। যা ফারসি কাব্যসাহিত্যে সীমাহীন গুরুত্ব বহন করে আসছে। শুধু ভারত উপমহাদেশে এর ব্যপ্তি সীমাবদ্ধ নয়; বরং বিশ্ব ফারসি কাব্যসাহিত্য আসরেও এর বিস্তৃতি অপরিসীম। নিম্নে আমির খসরু দেহলভীর ঐতিহাসিক মাসনভী গ্রন্থ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১. কেরানুস সা'দাইন

এটি সুলতান মুইজ উদ্দীন কায়কোবাদ এবং তাঁর পিতা সুলতান নাসির উদ্দীন বুগরা খানের সঙ্গে অযোধ্যায় সারযু নদীর তীরে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ নিয়ে *বাহরে রামালে মোসাম্মান* ওযনে লিখিত প্রথম ঐতিহাসিক বিখ্যাত মসনভী কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থটি কবি ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র রমজান মাসে রচনা সমাপ্ত করেন।[২৪] মাসনভী গ্রন্থ হিসাবে এটি কবির অনবদ্য ও শ্রেষ্ঠ অবদান।[২৫] এ গ্রন্থে বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনাবলী কবি স্ব-চক্ষে ও স্ব-শরীরে অবলোকন করে নিজস্ব রচনাশৈলী দ্বারা সুনিপুণভাবে কাব্যাকারে বর্ণনা করেছেন। তাই গ্রন্থটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঐতিহাসিক চিত্রকলার মর্যাদায় সমুন্নত। এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের দুই উত্তরসুরী স্বীয় পূত্র সুলতান নাসির উদ্দীন বুগরা খান ও স্বীয় পৌত্র সুলতান মুইজ উদ্দীন কায়কোবাদ অর্থাৎ পিতা-পূত্রের মাঝে ভ্রান্ত ধারনার সৃষ্টি অতঃপর তার অবসান। এ ছাড়াও এতে তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন স্থান তথা দিল্লী জামে মসজিদ, কুপ, বিভিন্ন ঋতু ও নববর্ষ উদযাপনের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।[২৬]

روز چو آخر شد و گرما گذشت	چشمه خور خواست ز دریا گذشت
تاجور شرق برآهنگ آب	کرد طلب کشتی گردون رکاب
کشتی شه تیز تر از تیر گشت	در زدن چشم ز دریا گذشت
راست که شد بر لب دریا رسید	گوهر خود بر لب دریا بدید
خواست که از سوز دل بی‌قرار	بر جهد از کشتی و گیرد کنار
صبر همی خاست نمی آمدش	گریه نمی خواست همی آمدش
بود برین سوی معز جهان	ساخته بر جای ادب چون شهان[২৭]

২. মেফতাহুল ফুতূহ

আমির খসরু দেহলভীর প্রতিটি ঐতিহাসিক মাসনবী গ্রন্থ একজন বাদশাহর সাথে সম্পৃক্ত। *মেফতাহুল ফুতূহ* কাব্য গ্রন্থটিও তেমনি সুলতান জালাল উদ্দীন ফিরোজ শাহ্ এর সাথে সম্পৃক্ত। এ গ্রন্থটি সুলতানের প্রথম সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে তাঁর চারটি বিজয়ের ঘটনার উপর কেন্দ্র করে রচিত। *বাহরে হাযাযে মোসাম্মান* ওযনে রচিত এ গ্রন্থটি ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন হয়। আর এটি হলো খসরু রচিত দ্বিতীয় ঐতিহাসিক মসনভী কাব্য গ্রন্থ।[২৮] *মেফতাহুল ফুতূহ* এর অর্থ হলো বিজয়ের চাবি। যেহেতু এ গ্রন্থটির বিষয়সস্তু পুরোটাই সুলতান জালাল উদ্দিন ফিরোজ শাহ-এর বিজয়াভিযানের সাথে সম্পৃক্ত তাই এ গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে *মেফতাহুল ফুতূহ* বা বিজয়ের চাবি। এছাড়াও এ গ্রন্থে সুলতানের রাজ-প্রাসাদের বর্ণনা, রাজার প্রতি দিল্লীর সুলতানদের অভ্যর্থনা, যুদ্ধ জয়ের কাহিনী, বিদ্রোহী গভর্নরের বর্ণনা এবং অযোধ্যার রাজার বর্ণনা স্থান পেয়েছ। এ গ্রন্থটিকে অনেকে কবির অপর একটি বিখ্যাত *দীওয়ান* গ্রন্থ *গুররাতুল কামাল* এর অংশ বিশেষ বলে ধারনা করে থাকে। সর্বোপরি সবকিছুর পাশাপাশি এ গ্রন্থে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব এবং সহজ-সরল ও প্রঞ্জল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে তা হলো সুলতান জালাল উদ্দীন ফিরোজ শাহ্-এর বিজয়ের ইতিহাস যা পাঠক মহলকে আকৃষ্ট করেছে বারবার।[২৯]

৩. দেবল রাণী খিজির খান

আমির খসরু রচিত *দেবল রাণী খিজির খান* একটি ঐতিহাসিক প্রণয় কাহিনী যা দিল্লী সালতানাতের তখনকার সময়কার প্রেম-ভালোবাসা, রাজনীতি ও ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত। এতে মুসলিম শাসক ও হিন্দু রাজকুমারীর প্রেম কাহিনী চিত্রিত হয়েছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে। আমির খসরু ছিলেন দিল্লী সালতানাতের দরবারী কবি। তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এ কাব্যগ্রন্থটি তিনি রচনা করেন। ঘটনাটি ঘটেছিল আলাউদ্দিন খিলজির শাসনামলে ১৩১৫ সালের দিকে গুজরাটের রাজ্য এবং দিল্লী সালতানাতের মধ্যে ঘটে যাওয়া সংঘাতের প্রেক্ষিতে। এর প্রধান চরিত্রে ছিলেন দেবল রাণী যিনি গুজরাটের রাজা কর্ণদেব ও রাণী কমলা দেবীর কন্যা একজন হিন্দু রাজকুমারী। অপর দিকে খিজির খান ছিলেন আলাউদ্দিন খিলজির পুত্র একজন মুসলমান রাজপুত্র। আলাউদ্দিন খিলজি গুজরাট আক্রমণ করলে, যুদ্ধে কর্ণদেব পরাজিত হয়ে পলায়ন

করেন। রাণী কমলা দেবী ও দেবল রাণী বন্দি হন। রাণী কমলা দেবীকে আলাউদ্দিন খিলজি তার হেরেমে জায়গা করে দেন এবং তিনি খিজির খানের জন্য দেবল রাণীকে উপযুক্ত মনে করেন এবং তাদের মাঝে বিয়ের আয়োজন করেন। দেবল রাণী ও খিজির খানের মাঝে গড়ে উঠে গভীর প্রেমের সম্পর্ক। কিন্তু দিল্লী সালতানাতের ভিতরে শুরু হওয়া ষড়যন্ত্র, রাজনীনৈতিক কূটচাল ও ক্ষমতার লড়াই তাদের সম্পর্ককে দিনে দিনে জটিল করে তুলে। আলাউদ্দিন খিলজির মৃত্যুর পর তার সেনাপতি মালিক কাফুর ক্ষমতা দখল করে খিজির খানকে অন্ধ করে দেন এবং পরে হত্যা করেন।[৩০] দেবল রাণী তার স্বামীর এই নিষ্ঠুর পরিণতির স্বাক্ষী হন এবং পরবর্তী জীবন অত্যন্ত বেদনায় অতিবাহিত করেন। এ কাব্যগ্রন্থটি শুধুমাত্র একটি প্রেম কাহিনী নয়; বরং ধর্ম, সংস্কৃতি, নারীর অবস্থান এবং মধ্যযুগীয় ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতার একটি প্রামাণ্য দলিল। আমির খসরুর ভাষা, কাব্যরীতি ও ঐতিহাসিক বর্ণনার মিশ্রণ একে অসাধারণ একটি ঐতিহাসিক সাহিত্যকর্মে পরিণত করেছে। সর্বোপরি বলা যায় *দেবল রাণী খিজির খান* কাব্যগ্রন্থটি প্রেম ও রাজনীতির যুগল রূপ। যেখানে ভালোবাসা ও ক্ষমতার সংঘাতে এক হৃদয় বিদারক পরিণতি উঠে আসে। এটি উপমহাদেশের সাহিত্য ও ইতিহাসে এক অমূল্য রত্ন। *বাহরে হাযাযে মোসাদ্দাস* ওযনে রচিত। এ গ্রন্থে দেবলরাণী ও খিজরখানের প্রেমোপাখ্যানের মাধ্যমে প্রেমের বিচিত্র লীলা, বিরহের যন্ত্রণা, মিলনের উচ্ছ্বাস এবং মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম আবেগ ও অনুভূতির বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রায় ৪২০০ টি পংক্তি রয়েছে।[৩১]

৪. নুহ সেপেহ্‌র

আমির খসরু রচিত *নুহ সেপেহ্‌র* বা নয়টি আকাশ ফারসি সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ যা দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির পুত্র মুহম্মদ বিন তুঘলক এর শাসনামলে ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়।[৩২] এটি আমির খসরুর সর্বশেষ ও পরিণত সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। নুহ শব্দের অর্থ নয় আর সেপেহর শব্দের অর্থ আকাশ বা গগন। এখানে নয়টি আকাশ বা গগনের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র বিষয়ের প্রতিক। *নুহ সেপেহর* মূলত একটি মাসনভী সংকলন। যেখানে প্রতিটি অধ্যায় বা আকাশ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিনিধিত্ব করে। ফারসি ভাষায় রচিত এ কাব্যগ্রন্থটির মাধ্যমে আমির খসরু তখনকার ভারতবর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম এবং প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ তুলে ধরেছেন। এ কাব্যগ্রন্থে নয়টি আকাশ বা অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। প্রথম আকাশে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও শেষ নবী মুহাম্মদ স.-এর উপর দরূদ প্রেরণ করে ইসলাম ধর্মের মৌলিক নীতি সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় আকাশে নবী-রাসুল ও অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে এবং তৃতীয় আকাশে মানব জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও চরিত্র গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা বর্ণনা করেছেন। চতুর্থ আকাশে বাদশাহ মুহম্মদ বিন তুঘলের গুণাবলী ও তার শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা এবং পঞ্চম আকাশে ভারতের প্রকৃতি ও জনপদের প্রশংসা এবং ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র তুলে ধরেছেন। ষষ্ঠ আকাশে হিন্দুদের জীবনধারা ও ধর্মীয় আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সপ্তম আকাশে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরেছেন। অষ্টম আকাশে প্রেম-ভালোবাসা, নারীসৌন্দর্য এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেছেন। নবম আকাশে কবিতার শিল্পরূপ, ভাষার ব্যবহার এবং নিজের কবিত্বশক্তির বিষয়ে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। সর্বোপরি বলা যায় *নুহ সেপেহর* কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় বা রাজনৈতিক প্রশস্তি নয় বরং এটি মধ্যযুগীয় ভারতের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার একটি কাব্যিক চিত্র। এটি আমির খসরুর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর অসামান্য ভাষাশৈলীর পরিচায়ক।[৩৩]

৫. তুঘলক নমে

আমির খসরু রচিত *তুঘলক নমে* কাব্যগ্রন্থটি গিয়াস উদ্দিন বলবনের রাজ্যপাট গ্রহণ, যুদ্ধজয়, ন্যায়পরায়ণতা ও শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে লিখিত। তিনি ছিলেন মূলত দিল্লীর সুলতানদের দরবারী কবি এবং একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ। আলাউদ্দিন খিলজির মৃত্যুর পর দিল্লীতে রাজনৈতিক অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয় খুব প্রকটভাবে। এ অবস্থায় গিয়াস উদ্দিন তুঘলক ক্ষমতায় আরোহণ করে দিল্লীর সালতানাতে নতুন শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। আর ঠিক সেই মুহুর্তে আমির খসরু দেহলভী তুঘলক শাসনের ন্যায়নীতি ও স্থিতিশিলতা তুলে ধরতে ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক এ মাসনভী গ্রন্থটি রচনা করেন। *তুঘলক নমে* গ্রন্থটি তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে। প্রথমত রাজনৈতিক অস্থিরতা তথা খিলজীর মৃত্যুর পর ভারত বর্ষের নানা অংশে যে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং দিল্লী সালতানাতের দূর্নীতি ও দুর্বলতার যে চিত্র তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে কাব্যাকারে এ গ্রন্থে তা উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত গিয়াস উদ্দীন তুঘলকের উত্থান তথা তিনি কিভাবে সাহস, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার সাথে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং তাঁর সেনা নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা, যুদ্ধজয় এবং শাসনের ন্যায়নীতি সম্পর্কিত আলোচনা এখানে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয়ত শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা তথা সুলতান গিয়াস উদ্দিনের ন্যায়পরায়নতা ও জনগণের প্রতি সুবিচারের বর্ণনার পাশাপাশি তিনি যে ইসলামের একজন আদর্শ শাসক ছিলেন তার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন।[৩৪]

তুঘলক নমে গ্রন্থটি মূলত মধ্যযুগীয় ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা, একটি নতুন যুগের সূচনা এবং একজন আদর্শ শাসকের প্রতিচিত্র তুলে ধরার চমৎকার নিদর্শন। আমির খসরুর এই রচনা তাঁকে শুধু একজন কবি নয়; বরং একজন ঐতিহাসিক ও চিন্তাশীল বিশ্লেষক হিসেবেও প্রতিয়মান করে।

অন্যান্য রচনাবলী

কবি আমির খসরু *দীওয়ান* ও মসনভী কাব্যগ্রন্থগুলোর পাশাপাশি আরও কিছু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় যা ভারত উপমহাদেশে ফারসি চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো।

খাযাইনুল ফুতুহ

খাযাইনুল ফুতুহ বা বিজয়ের ধনভাণ্ডার ফারসি সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ যা দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির রাজত্বকালে ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। গ্রন্থটির কিছু অংশ পদ্য এবং কিছু অংশ গদ্যাকারে রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির শাসনামলে তাঁর সামরিক বিজয়, সাফল্য উদযাপন, যুদ্ধজয়, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের প্রসার প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও এ গ্রন্থে গুজরাট অভিযান, রণথম্ভোর যুদ্ধ, চিতোর দখল এবং দক্ষিণ ভারত অভিযানের কথাও বর্ণিত হয়েছে। মূলত *খাযাইনুল ফুতুহ* হলো মধ্যযুগীয় ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক এবং ধর্মীয় বাস্তবতার একটি মূল্যবান দলীল।

রাসাইলুল ইজাজ

রাসাইলুল ইজাজ আমির খসরু দেহলভীর গুরুত্বপূর্ণ একটি গদ্যগ্রন্থ। রাসাইল শব্দের অর্থ হলো, চিঠি বা প্রবন্ধ এবং ইজাজ শব্দের অর্থ অলৌকিকতা বা অলংকারময়তা। এটি মূলত আমির খসরু রচিত রাজকীয় ফরমান এবং প্রশাসনিক বার্তা সংকলন যার মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের নিকট পাঠানো কূটনৈতিক বার্তাসমূহ। এ গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অত্যন্ত অলঙ্কারময়, চমকপ্রদ ও চিন্তাশীল গদ্যরীতি।[৩৫] এ গ্রন্থটি ফারসি গদ্যের বালাগাত বা অলঙ্কার শাস্ত্রের কৌশল ব্যবহার করে রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনি শুধু পদ্য নয় গদ্য রচনাতেও বেশ পারদর্শী। গ্রন্থটি ফারসি গদ্যের একটি মাস্টারপিছ হিসেবে বিবেচিত হয়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দিল্লী সালতানাতের দাপ্তরিক ভাষা এবং ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও এ গ্রন্থে রাজনৈতিক দূরদর্শীতা, কূটনৈতিক কৌশল এবং ভাষার শৈল্পিক ব্যবহারের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। *রাসাইলুল ইজাজ* গ্রন্থটি আমির খসরু দেহলভীর গদ্য প্রতিভার এক অনন্য নিদর্শন। ১,৮৬৭টি শ্লোকের সমন্বয়ে রচিত এ বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থটি ১৩১৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়।[৩৬]

আফযালুল ফাওয়ায়েদ

আমির খসরু রচিত *আফযালুল ফাওয়ায়েদ* গ্রন্থটি ভারতীয় উপমহাদেশের ফারসি সাহিত্যের এক অমূল্য দর্পণ। এ গ্রন্থটি মূলত কবির আত্মিক গুরু নিযাম উদ্দীন আওলিয়ার বাণী, উপদেশ ও জীবনচরিতের সংকলন। যা আমির খসরু নিজেই সংকলন করে ১৩১৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে উপহার দেন।[৩৭] গ্রন্থটিতে নিযাম উদ্দীন আওলিয়ার মুখনিঃসৃত বাণী, দুনিয়ার মোহ ত্যাগ, খোদা প্রেম, আত্মসংযম, বিনয় ও মানবতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও এ গ্রন্থে নিযাম উদ্দীন আওলিয়ার জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ কিছু ঘটনা, তাঁর আচার আচরণ, দর্শনার্থীদের সাথে ব্যবহারের নমুনা, দরবেশদের জীবনচর্যা, মুরিদ ও পীরের সম্পর্ক, আত্মশুদ্ধি ও ভক্তির মূলমন্ত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সার্বিক বিশ্লেষণে প্রতিয়মান হয় যে, *আফযালুল ফাওয়ায়েদ* গ্রন্থটি নিযাম উদ্দীন আওলিয়ার বাণী সংকলনের পাশাপাশি এটি ভারত উপমহাদেশের সূফী ঐতিহ্য, মানবিক মূল্যবোধ ও আত্মিক চিন্তার এক জীবন্ত দলীল।[৩৮]

উপসংহার

হিন্দুস্তানের তোতাপাখি ও হিন্দুস্তানের সাদী খ্যাত কবি আমির খসরু ছিলেন ভারত উপমহাদেশের একজন নামকরা কবি। যিনি একজন হিন্দী ভাষাভাষি মানুষ হয়েও ফারসি ভাষায় এমন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম রচনা করে গেছেন যার প্রভাব আজও বিশ্ব সাহিত্য পরিমন্ডলে বিরল। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে খ্যাতিমান ও কীর্তিমান একজন মানুষ। তাঁর রচিত কাব্যসমূহ ভারত উপমহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমানভাবে পরিচিত। তিনি সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় বিচরণ করে শুধু নিজেকে মানুষের নিকট প্রসিদ্ধ করে যাননি; বরং সারা ভারত উপমহাদেশকে তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে পৃথিবীর কাব্য পিপাসু মানুষের নিকট পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এজন্যই যতদিন পৃথিবী থাকবে, সভ্যতা থাকবে, মানুষের মাঝে প্রেম ভালবাসা, মানবতা ও পারস্পরিক সৌহার্দ থাকবে ততদিন এ উপমহাদেশসহ সমগ্র বিশ্ববাসীর মনের মণিকুঠায় কবি আমির খসরু দেহলভী চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

১ E.J Brill, *Encyclopedia of Islam,* New Edition, Vol.4 (Leiden: 1979), p. 444.
২ মির্জা মকবূল বেগ বাদাখশানী, আদাব নামেয়ে ইরান (লাহোর: আসিফ জাভিদ, তা. বি), পৃ. ৪৮৭।
৩ আদাব নামেয়ে ইরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮।
৪ J. A. Boyle, The Cambridge History of Iran, p. 606.
৫ ড. যাবিহ উল্লাহ সাফা, তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান, ৫ম খণ্ড (তেহরান: এন্তেশারাতে অহাঙ্গ, ১৩৬৯ হি.শা./ ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৭৭৭।
৬ Joel Waiz lal, *An Introductory History of Persian Literature* (Delhi: The Imperial Book Depot Press, 1925), P.143.
৭ ড. যাবিহ উল্লাহ সাফা, তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান, ৫ম খণ্ড (তেহরান: এন্তেশারাতে অহাঙ্গ, ১৩৬৯ হি.শা./ ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৭৭৯।
৮ আব্দুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২০০।
৯ প্রাগুক্ত, পৃ.২১৯।
১০ Mohammad Habib, Hazrat Amir Khusrau of Delhi (Bombay: D. B. Tarapore vala & Co. 1927), p. 5.
১১ *https://ganjoor.net/khosro/gozide/ghaside-khosro/sh1*
১২ Hazrat Amir Khusrau of Delhi, p. 6.
১৩ মুসলিম মনীষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।
১৪ ড. রেযা যাদেহ শাফাক, তারিখে আদাবিয়াতে ইরান (তেহরান: এন্তেশারাতে অহাঙ্গ, ১৩৬৯ হি.শা./ ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ২৯০।
১৫ মুসলিম মনীষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।
১৬ তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮০।
১৭ মুসলিম মনীষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।
১৮ তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৩; ঐধুৎধঃ অসরৎ কযঁংৎধঁ ড়ভ উবষযর, ঢ়. ৬.
১৯ আদাব নামেয়ে ইরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৮।
২০ ড. অসফে যামানী, দানেশ-৩৫, পৃ. ১৭০।
২১ তারিখে আদাবিয়াতে ইরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।
২২ তদেব।
২৩ আদাব নামেয়ে ইরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯।
২৪ A. J. Arberry, Classical Persian Literature (London: George Allen and Unwin Ltd, 1958), P. 276; তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮০-৭৮১।
২৫ মুসলিম মনীষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।
২৬ মির্জা মকবূল বেগ বাদাখশানী, আদাব নামেয়ে ইরান (লাহোর: আসিফ জাভিদ, তা. বি), পৃ. ৪৯৭।
২৭ *https://ganjoor.net/khosro/gozide/masnaviatkh/sh28*
২৮ J. A. Boyle, The Cambridge History of Iran, Vol-5 (Cambridge: Cambridge University Press), p. 606.
২৯ হাসান আনুশে সম্পাদিত, দানেশ নামেয়ে আদাবে ফারসি, ৪র্থ খণ্ড (তেহরান: সাযেমানে চাপ ও এন্তেশারাতে ওয়াযারাতে ফারহাঙ্গ ওয়া এরশাদে ইসলামী, ১৩৮০ হি. শা./ ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৭৫।
৩০ মুসলিম মনীষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১; The Cambridge History of Iran, Vol-5, p. 606.
৩১ মুসলিম মনীষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১; আব্দুস সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ৫৭।
৩২ The Cambridge History of Iran, Vol-5, p. 606.
৩৩ মুসলিম মনীষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।
৩৪ ড. আফতাব আসগর, তারিখ নেভিসিয়ে ফারসি দার হিন্দ ওয়া পাকিস্তান (লাহোর: চাপখানেয়ে সায়েদ সান্জ, ১৩৬৪ হি. শা./ ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ২১৮।
৩৫ তারিখে আদাবিয়াতে ইরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২।
৩৬ Ibid.
৩৭ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি.)।
৩৮ A. J. Arbery, Classical Persian Literature (London: Kuskin House George Allen and Unwin LTD, Museum Street, 1958), p 280.